চতুর্থ অধ্যায়

বীতশোক ভট্টাচার্যের কবিতায় গ্রামচেতনা, লোকায়ত জীবন ও লোকসংস্কৃতি

গ্রাম হল জনবসতির সংঘবদ্ধরূপ। প্রধানত কৃষিভিত্তিক অঞ্চলে মনুষ্য সম্প্রদায়ের ছোট বসতি। যেখানে বসবাসরত মানুষ কৃষিকাজ ও বিভিন্ন ছোটোখাটো কাজের মাধ্যমে খুব সাধারণভাবে জীবনযাপন করে। গ্রাম শহরের চেয়ে ক্ষুদ্র, Hamlet বা ছোটোগ্রামের থেকে বড়। কয়েকশত থেকে কয়েক হাজার চিরস্থায়ী জনবসতি নিয়ে গড়ে ওঠে গ্রাম। তবে গ্রাম স্থান নয়, কেননা গ্রামের আয়তন ও জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হতে পারে। বড় শহর বা রাজধানী থেকে দূরে অবস্থিত বলে গ্রামে শহরের মতো আধুনিক সুযোগ সুবিধা থাকে না। প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজে কৃষিভিত্তিক গ্রাম ছিল রাজস্ব আহরণের একটি উপায়।

ভারতবর্ষের বর্তমান লোকসংখ্যার শতকরা ৮২জন গ্রামে বাস করে তবে একরকম লোক গ্রামে থাকে না। আবার বাংলাদেশের গ্রামে নানা পেশার লোকজন বাস করলেও কৃষিজীবীর সংখ্যাই প্রধান। এই ধরনের গ্রামের বাইরেও কোন কোন সময় পেশাভিত্তিক গ্রাম গড়ে উঠে। যেমন কামারদের গ্রাম, কুমোরদের গ্রাম, তাঁতি গ্রাম ইত্যাদি। প্রাচীন বাংলায় ছিল তিন প্রকার গ্রাম — ক) মিশ্রগ্রাম খ) শিল্পগ্রাম গ) প্রান্তগ্রাম।

মিশ্রগ্রামগুলিই চাষিগ্রাম কারণ বিভিন্ন পেশার লোকের থেকেও কৃষককুলেরই প্রাধান্য বেশি। শিল্পগ্রাম গড়ে ওঠে কামার, কুমোর, ছুতোর, তাঁতি প্রভৃতি পেশার লোকদের নিয়ে। আর লোকালয় থেকে দূরে যে গ্রাম গড়ে ওঠে তাই প্রান্ত গ্রাম। জাতকে এই ধরনের গ্রামকে অনিশ্চিত বলে উল্লেখ করা হলেও 'রামায়ণে'[১] প্রান্তগ্রামের সুখী জীবনযাত্রার বর্ণনা আছে।

গ্রামের সামাজিক স্রোতধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। তাই গ্রামের অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত মন্দির, মসজিদ, চার্চ ইত্যাদি। গ্রামের বেশির ভাগ মানুষ গরীব, সহজ, সরল, সাধারণ। হিন্দুপ্রধান গ্রামের কেন্দ্রস্থলে বাস করেন ব্রাহ্মণ বা জমিদার বা উচ্চবর্ণের মানুষ। গ্রামের প্রান্ত ভাগে বাস করেন নীচু-বর্ণের ব্যক্তিরা। অনেক গ্রামে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এখন বিদ্যালয় শিক্ষা সবার সামর্থ্যের মধ্যে।

ভারতবর্ষ গ্রাম-প্রধান। গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর মুখে মুখে রচনা করে ছড়া, গান, রূপকথা ইত্যাদি। জীবনের আদর্শ খুঁজে পায় ছড়া, ব্রতকথা, উপকথা বা পুরাণ প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে।

এই অতিতুচ্ছ সাধারণ মানুষ যারা ভূমিজীবী, শ্রমজীবী, প্রাকৃতজন তারাই লোক।

"লোকেষু-আয়তো লোকায়তঃ"[২] জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে বলেই লোকায়ত নাম হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের মতে 'লোকায়ত' শব্দটির অর্থ যার পরিচয় পাওয়া যায় জনসাধারণের মধ্যে। 'জনসাধারণের দর্শন' ও 'বস্তুবাদী দর্শন' উভয় অর্থেই 'লোকায়ত' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। আধুনিক বিদ্বান যাঁরা তাঁরা লোকায়ত শব্দটিকে বস্তুবাদ অর্থে গ্রহণ করেছেন। লোকায়ত দর্শনের মূল ভিত্তি বলেছেন লোক বা ইহলোক। হরিভদ্রসূরি 'ষড়দর্শণসমুচ্চয়'-এর ৮১ শ্লোকে বলেছেন লোক বলতে 'শুধু সেইটুকুই যা হল ইন্দ্রিয়গোচর'। টীকাকার মনিভদ্রের মতে লোকের অর্থ পদার্থসার্থ বা পদার্থসমূহ। অর্থাৎ — "প্রত্যক্ষগোচর পদার্থই একমাত্র সত্য। তারই নাম লোক, লোক-সর্বস্ব বলেই দর্শনটির নাম লোকায়ত।"[৩] পালিসাহিত্যে তার্কিক চার্বাকগণকেই বলা হয় লোকায়ত। ভারতীয় জীবনের মূল শিকড় প্রোথিত লোকায়ত বিশ্বাসের গভীরে। বিশ্বাস, প্রথা, ঐতিহ্য, ধর্মসংস্কার, মেলা, উৎসব এগুলো নিয়েই লোকজীবন।

প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক যে সব মানুষের, প্রকৃতির ভেতরের রহস্য যাঁরা বোঝেন উচ্চবর্ণের সমাজ সেই ভূমিপুত্রদের নগরের বাইরে স্থান দেন। এই সামাজিক নিয়ম বিজ্ঞানচর্চার পক্ষে ক্ষতিকারক, এ প্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের লেখা 'হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের কথা বলা যায়। এখানে বিজ্ঞানচেতনার অবক্ষয়ের কারণের জন্য তিনি দুটি অভিযোগ করেন — ১) সামাজিক ২) ধর্মীয় মতাদর্শ।

এই পার্থিব জগৎ মায়া। আর ভেষজর গুনাগুন বিজ্ঞান এবং পার্থিব। লোকায়তিক বিজ্ঞানচর্চা তখন মায়াবাদী হিন্দু সমাজের পক্ষে ছিল অনুচিত। অথচ পার্থিব জগতের ভূমিপুত্রদের ভেষজের গুণাগুণ নিয়েই হয় বিজ্ঞানচর্চা।

ভূমিপুত্র যারা তাদের সমাজ থেকে বের করে দেওয়া হয় ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি নিষেধের জন্যই। মুসলমান আক্রমণের সময় প্রয়োজনবশতঃ ভূমিপুত্রদের গ্রহণ করা হলে তাঁদের আচার-অনুষ্ঠান হিন্দুসমাজে স্থান পায়। ছলে-বলে-কৌশলে হিন্দুসমাজ তখন সবকিছু নিজের বলে

প্রচার করে। এরও নজির আছে রামায়ণ মহাভারতে।

গ্রামীণ কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী এবং পুরাতন ঐতিহ্যের ধারক-বাহকই হল লোক। এই শব্দের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী, পশ্চাৎপদ জনসমাজ, একই রকম স্বার্থবন্ধনে আবদ্ধ জনগোষ্ঠী, সাধারণ মানুষ কৃষিসমাজ প্রভৃতি নির্দেশিত হয়।

লোকায়ত মানুষের জীবনযাপন ও জীবনসংগ্রাম এবং চিন্তা ও চেতনার ফলশ্রুতিই লোকসংস্কৃতি, এর মূল উৎস মানবজীবন। মানুষের বাস্তব ও ভাবজগতের অনেকরকম সম্পদ লোকসংস্কৃতির মধ্যে নিহিত থাকে। লোকসংস্কৃতির ধারায় জমা থাকে হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, ধ্যান-জ্ঞান-কল্পনা প্রভৃতি। এটি ঐতিহ্যাশ্রয়ী, মন্থর কিন্তু স্থবির ও রূপান্তর অক্ষম নয়। বলা যায় বহমানকালের ধারাবাহিকতার নিদর্শন।

লোকসংস্কৃতি আদিম ও আধুনিক সভ্যতার মধ্যভূমি, লোকায়ত সংহত সমাজের সমষ্টিগত মানুষের জীবনচর্যা ও মানসচর্চার সামগ্রিক কৃতি[৪], আহার-বিহার, উৎসব-অনুষ্ঠান, শিল্প-সাধনা-সঙ্গীত-সাহিত্য, বিশ্বাস-সংস্কার প্রভৃতি সমাজ থেকে জাত লোকায়ত জীবনের নানান কর্মকাণ্ডের নির্দেশনা দেয় লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতি এখন কেবলমাত্র কৃষিপল্লীজীবন কেন্দ্রিক নয়, অতীত ঐতিহ্যাশ্রয়ী পুরাতাত্ত্বিক বিষয়ও নয়,– আধুনিক সমাজ ও জীবনের সর্বত্র এর বিস্তার। এর মধ্যে আছে 'স্থিতিস্থাপকতা ও গতিশীলতা', ধারাবাহিক ঐতিহ্য, নতুনরূপে গ্রহণ ক্ষমতা। লোকসংস্কৃতি দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের আবর্তে একটা নির্দিষ্ট কালের হয়েও সর্বকালিক। আঞ্চলিক তবে বিশ্বমানবিক, ঐতিহ্যমূলক কিন্তু পরিবর্তনমুখী। লোকসংস্কৃতি গড়ে ওঠে 'ভৌগোলিক প্রাকৃতিক প্রভাব, ঐতিহাসিক সামাজিক পটভূমি, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি এবং সামগ্রিকভাবে জীবনযাপনকে কেন্দ্র করে। এর মধ্যে প্রতিফলিত হয় 'অতীতের প্রতিধ্বনি, সমকালের অভিজ্ঞান এবং ভবিষ্যতের প্রতিরূপ।'[৫]

বিশ্বাস-সংস্কার, রীতিনীতি, জীবনাচরণ, উৎসব-পার্বণ নিয়েই দীর্ঘসময় ধরে একটি সমাজের পথ চলা। শিল্পী তাঁর শিল্পকর্ম গড়ে তোলেন লোকজীবন, লোকসংস্কৃতি থেকে উপাদান নিয়ে।

কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের কাব্য আলোচনায় প্রাকৃত ও অন্ত্যজ জনের কথা আছে। আছে লোকায়ত গ্রামীণতা, বাংলার পালপার্বণ-লোকাচার-ছড়া-উৎসব-গান-রূপকথা-পুরাণ প্রসঙ্গ। আদিবাসী লোকজীবন, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বাংলার বিস্তৃত প্রান্তিক লোকজীবন থেকে

উপাদান গ্রহণ করে তিনি তাঁর রচনাকে সমৃদ্ধ করেন। মানুষের জীবন, চিন্তাভাবনা, সৃষ্টির রহস্য, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা কবির কবিতায় মানুষের জীবন পথ নির্দেশক হয়ে ওঠে। লোকবিশ্বাস, লোকঐতিহ্য, লোকপ্রতীক কবির অভিজ্ঞ কলমে প্রকৃত সাহিত্যে রূপায়িত হয়। লোকায়ত মনের গড়ন তিনি ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন 'ছড়ার গঠন'[৬] লেখাতে।

বাংলা কবিতা লোককাব্য। এর স্বভাব গ্রাম্য, নিরক্ষর। কখনো গ্রামীণ লোকসাহিত্যকে দূরে রেখে কাজ করেনি বাংলা কবিতা। সাহিত্য রুচিহীন রচনা বলে মনে হলেও লোককবিতাকে কবি বর্জন, উপেক্ষা না করে বলেছেন — 'লোক কবিতার ঐতিহ্য বাংলায় সক্রিয়।'[৭] বাংলা লোককবিতার অর্থ দেখার কথা কবি বলেননি, বলেছেন ব্যবহার দেখার কথা। তাঁর সম্পাদিত 'হাজার বছরের বাংলা কবিতা'য় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে লোকায়ত জীবন ভাবনা ও চিরায়ত ইতিহাসচেতনা।

কবি মনে করেন 'বাংলা কবিতার ইতিহাসের উৎস' সন্ধানের জন্য 'বাংলার আদিবাসী উপজাতিদের লোকবিশ্বাস এবং জীবন আচরণের' মধ্যে যাওয়া বেশি ভাল। মেদিনীপুরের পট ও বাঁকুড়ার পোড়ামাটির কথা বলেছেন তাঁর কবিতায়। বাংলা কবিতার মুক্তি ঘটেছে লোকায়ত ক্ষেত্রে। তাঁর কবিতায় ভাবাকুল লোকায়ত মুখিতা নেই। আছে কাঁসাই নদীর কথা, আছে মেদিনীপুরের লোকজনের কথা :

" ...কাঁসাই নদীর কাদা মেয়েটির চুলে
লেগেছিল, তা জানে না মেদিনীপুরের লোকজন।"[৮]

('অন্তর্জলি', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা)

'যাই' কবিতাতে কবির নস্টালজিক মনোভাব কাজ করেছে। সন্ধ্যে হলেই বাড়ি ফেরার টান, মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা যেন গ্রাম্যচেতনাকে জাগিয়ে তোলে :

"সন্ধ্যে হলে এ টানটুকুই বাড়ি ফেরার মতন।
'মা গো' বলে কাকে যেন ডেকে উঠবে তাই
আসছি, ও মা, যাই।"[৯]

('যাই', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা')

কবির যাত্রা বৈদিক থেকে অবৈদিক, অভিজাত সংস্কৃতির কাছ থেকে লোকায়ত সংস্কৃতির দিকে : মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে পৌষ সংক্রান্তির সময় আর মাঘমাসের পয়লাতে গ্রামদেবতার

পুজো হয়। এই দেবতারা গাছের তলায় অধিষ্ঠান করেন। কুমোরদের তৈরী পোড়ামাটির হাতিঘোড়া এই পুজোর সামগ্রী। প্রতিবছর এই পুজো চলে। পুজোপাট সমাপ্ত হলে হাতি-ঘোড়া সেখানেই থাকে। এই পুজো লোকসংস্কৃতির অঙ্গ। পোড়ামাটির হাতি ঘোড়া বানানোর মধ্য দিয়ে লোকশিল্পের ইঙ্গিত ফুটে ওঠে।[১০]

কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের কবিতা এরকমই। গ্রাম, গ্রামের মানুষ, তাদের আচার এবং সংস্কৃতি, লোকায়তিক ভাবনা সমস্ত কিছুই একসঙ্গে জুড়ে আছে। 'শম' কবিতাটি তুলে ধরি :

"হাওয়া উঠল শেষ রাতে, শব্দ করে খুলে গেল কপাট জানালা,
খোলা ঘর ফেলে রেখে বেরিয়ে এলাম আমি – ওই খালি ঘর।
এই শূণ্য আকাশ। ঊষা উঠছে সবে, দুটো একটা তারা ডুবছে।
আমি খুলে ফেলেছি শিরা স্নায়ুর পাশ; ক্ষয়কাশ আমার বাবার,
পিতামহীর থেকে গ্রহণী আমার, প্রবৃদ্ধ প্রপিতামহের অপস্মার।
রুগ্‌ণ আমি, নাও হাতে পরিয়ে দাও অর্জুনের ছাল, যবের তুষ, তিলের মঞ্জরী,
রুগ্‌ণ আমি, দাও আমাকে শুইয়ে দাও মাটির ওপর হালের নিচে।
নমস্কার লিঙ্গ, নমস্কার লাঙ্গল, তোমাকে প্রণাম হে যুগনদ্ধদেবতা।
তোমাকে প্রণাম হে বীরর্ষভ, তোমাকে প্রণাম হে বীরুৎ।
কত রাত্রির রোগ যে আমার, অনাময় আমার এই ভোর–রাতে।"[১১]

('শম', 'প্রদোষের নীল ছায়া')

লোকজীবন, লোক ঐতিহ্যের কবিতা 'শম'। আপাতভাবে মনে হতে পারে এ কবিতায় কবি আত্মার কথা বলেছেন, যে আত্মা দেহ ছেড়ে যায়, কিন্তু তা নয়। কবিতাতে গ্রামীণ মানুষ, তাদের আচার সংস্কৃতি, সেই সঙ্গে লোকায়তিক ভাবনা উপস্থিত। অথর্ববেদ থেকে দ্বিতীয় কাণ্ড প্রথম অনুবাক তৃতীয় সূক্ত[১২] 'শম' কবিতার উপর গভীর ছায়া মেলে আছে। সূক্তে আছে :

অথর্ববেদের কালে মানুষ যে আচারের সাহায্যে ক্ষেত্রিয় অসুখ দূর করার চেষ্টা করতেন এই কম্পিউটার যুগেও গ্রামীণ মানুষ পথের চৌমাথায় অথবা তিনমাথায় ভোররাত্রে এরকম আচরণ করে থাকেন।

কবিতাটির ঘটনা ঘটেছে ঊষাকালে। রাত্রিশেষ অর্থাৎ ঊষাকালে ক্ষেত্রিয় অসুখ-কুষ্ঠ, ক্ষয়, গ্রহণী প্রভৃতি অসুখ থেকে মুক্তি পেতে জলপূর্ণ ঘট এই সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্দ্রিত করে,

যিনি ব্যাধিগ্রস্থ তাঁকে ঘরের বাইরে স্নান করতে হয়। তারপর তিলের মঞ্জরী, যবের তুষ ও অর্জুন কাঠের টুকরোতে মন্ত্র পড়ে হাতে বেঁধে দেওয়া হয়। অসুস্থ ব্যক্তিকে বৃষভযুক্ত হলের নীচে শুইয়ে রেখে ঐ ঘটের জল ছেটানো হয়। অসুস্থ ব্যক্তিটি যে ঘরে ছিলেন সেই ঘরের সমস্ত জানালা দরজা খুলে দিয়ে ঘরকে শূণ্য করতে হয়। অর্থববেদের ঊষাকালে রোগমুক্তির প্রার্থনা, আচার, শূণ্যগৃহের ছবি কবির 'শম' কবিতায় আছে। কিন্তু এই ঊষা কেবলমাত্র বৈদিক দেবতা নয়। 'ধর্মানন্দ কোসম্বী' মনে করেন, সিন্ধু সভ্যতার মাতৃদেবী ঊষা। প্রমাণস্বরূপ তিনি ঋগ্বেদে[১৩] ঊষাকে নিষ্পিষ্ট করার কাহিনী তুলে দেখিয়েছেন। ঊষা দৌ-এর কন্যা। সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে আমাদের দেশের আর্য নন এমন মানুষদের যোগাযোগ ছিল বা আছে। তাছাড়া অর্থববেদকে বেদ হিসেবে স্বীকার করাই হত না।[১৪] সমস্ত চিকিৎসকের জন্য স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ — মৈত্রী উপনিষদে এরকম নির্দেশ পাওয়া যায়।

কবি এ কবিতায় যুগনদ্ধদেবতাকে প্রণাম জানিয়েছেন। নমস্কার করেছেন লিঙ্গ এবং লাঙ্গলকে। হরপ্পা সভ্যতায় যুগনদ্ধ দেবতা নেই, কিন্তু লিঙ্গ পূজা এবং লাঙ্গল ছিল। শব্দদুটিও সমার্থক। 'শ্রীভগবদ্গীতা'য় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 'ভরতর্ষভ', 'পুরুষর্ষভ' ইত্যাদি বিশেষণে নন্দিত করেছেন। কবি গীতার অনুকরণে এ কবিতায় 'বীরর্ষভ' দেবতাকে প্রণাম জানিয়েছেন। বীরর্ষভ যুগনদ্ধদেবতা। একই সঙ্গে বহুর মিশ্রণে এই দেবতা নতুন কিছু। বীরর্ষভ শব্দটির অর্থ 'যিনি বীর তিনিই ঋষভ বা শ্রেষ্ঠ'। আবার 'ঋষভ' কথার অর্থ 'বৃষ'। এককথায় 'বীরশ্রেষ্ঠ' বা 'বীরবৃষ'। প্রণাম জানিয়েছেন 'বীরুৎ'কে যে একটা লতামাত্র। এবং এই লতা ঔষধ স্বরূপ। ক্ষয়, অপস্মার প্রভৃতি রোগ থেকে মানুষকে মুক্ত করে। বলাবাহুল্য প্রণমিত এখানে যা কিছু কেউই পৌরাণিক দেবতা নন। যুগনদ্ধ ভাবনা হরপার্বতীর মিলিত রূপ হলেও 'যুগনদ্ধ' শব্দটি অত্যন্ত অর্বাচীন। বৈদিক সাহিত্যে এমন কোনো দেবতা নেই। জার্মান পণ্ডিত হাইনরিখ জিমার[১৫] মনে করেন — দুটি বিরুদ্ধ প্রকৃতির মিলন অর্ধনারীশ্বরের মধ্যে। বৌদ্ধতন্ত্রের হেরুক ও নৈরাত্মা যুগনদ্ধরূপে পূজিত। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বৌদ্ধদের দেবদেবী' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কবি বীতশোক ভট্টাচার্য 'যুগনদ্ধ'[১৬] নামে একটি গল্পও লেখেছিলেন। সে গল্পে নারীর কমনীয়তা বা মানসিকতা ঠাঁই পেয়েছে মানুষের আপাতপৌরুষের আড়ালে। তাই যখন 'যুগনদ্ধ' শব্দটি আমরা বিশ্লেষণ করি : "পিনদ্ধ অর্থাৎ অপি + নহ (বন্ধন করা) + ত = যা বন্ধন করা হয়েছে। এখানে অপির 'অ' লোপ পেয়েছে। তেমনি যুগনদ্ধ অর্থাৎ যুগবন্ধন করা

হয়েছে। যুগ বলতে যেমন Time বা সময় বা কাল বোঝায় তেমনি লাঙলের দুটি গরু জুড়ে দেওয়া জোয়ালও বোঝায়। ম্যাক্সমুলার সম্পাদিত 'স্যাক্রেড বুক অফ ইস্ট' গ্রন্থের ৫০ খণ্ডে এই দুটি অর্থ পাওয়া যায়।"[১৭]

যুগে আবদ্ধ পশু ছাড়া হল কর্ষণ করা যায় না এটা যেমন ঠিক, একইভাবে বিশ্বাস্য ঊষার আবির্ভাবের সময় ও সূর্যের উদয় হওয়ার আগের সময় অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করে। রাত্রির অবসান এবং দিনের আগমণ এই দুটি সময়ের মধ্যে ঊষা দেবী অবস্থান করেন। হল ও ক্ষেত্র বা ভূমির শরীর কর্ষণের বিষয়টিও যুগ্ম। আবার পূর্বসুরীদের কাছ থেকে বর্তমানে পাওয়া বহমান অসুখও আবদ্ধ, যা থেকে মুক্তি প্রার্থনা।

ঋগ্বেদের মানুষজন প্রার্থনা করেছিলেন ইন্দ্রকে। গীতায় অর্জুনের প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন। এ কবিতায় কবি বীরর্ষভ যুগনদ্ধকে প্রার্থনা করেছেন। বলাবাহুল্য এই যুগনদ্ধ কোনো দেবতা নয়। যুগনদ্ধ মানুষের চরিত্রের বহুত্বকে ইঙ্গিত করে। সমস্ত ভিন্নরূপ অথবা ভিন্নপ্রকৃতি কিম্বা ভাবনা একটি রূপের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে মানুষকে অনাময় করবে এবং সে অনাময় ঘটবে ভোর রাতে যখন ঊষা আসছে এবং রাত্রি দূরে সরে যাচ্ছে। এমন এক লোকায়তিক ভাবনা গোটা কবিতাটিতে চারিয়ে আছে। কারণ কোনো দেবতা বেদ অথবা পুরাণ থেকে এখানে আসেননি। গড়ে উঠছে কবির মনের মধ্যে যিনি লৌকিক আচার থেকে, লোকসংস্কৃতি থেকে, লোকায়তিক ভাবনা থেকে মানুষের ভেতরের সমস্ত অসুখকে নির্মূল করবেন। 'শম' শব্দটির অর্থও তাই ইঙ্গিত করে। কবিতাটি নির্দিষ্ট কোনো কৃত অর্থের মধ্যে আবদ্ধ নেই, চলাচল করতে চায় নতুন এক পাঠে। গ্রামীণ মানুষ তার আচার ও সংস্কৃতি, তার লোকায়তিক ভাবনা, সেই সঙ্গে ধূসর ইতিহাসের প্রেক্ষাপট, লতাপাতার ঔষধ, কৃষির ইঙ্গিত সবকিছু নিয়ে একটি বহুত্ববাদী পাঠ হয়ে উঠতে চাইছে।

লোকায়ত জীবন এবং প্রাত্যহিক জীবন কবির কবিতায় সমান্তরাল। একটির থেকে অন্যটিকে আলাদা করা যায় না। এরকমই একটি কবিতা 'অগ্রন্থিত কবিতা'র 'বিচার' কবিতাটি :

'শ্মশানের শান্তি নামা মাঠ।
থমথমে পাথরের চাঁই।
উচাটন মন্ত্র করি পাঠ।
ঈশ্বরের চেয়ে ঘোর ভারি

পাথর, তুলতে তোকে চাই।
অন্ধকার আমার বিধান।
ভাই বন্ধু হাট থেকে ফিরি।
আড়বাঁশি মুছে ফেলে রেশ।
লাঠি ভেঙে কে রাত ভিখারী
বলে : অন্ধ এই সেই স্থান।
বিচারক তাই এ পাষাণ।

আকাট রাখাল এর উপর
বসে দিত সাবলীল রায়।
কুড়ানিরে, এই নে পাথর —
ভাঙ কোষ — ফুটিয়ে পালায়।
ধান কেটে নিয়ে যায় যদি
গলাকাট্, দে হেঁসোতে শান।

বত্রিশ সিংহাসন ঠিক
তোরই নীচে সংহত পাথর।
খরা মাঠে, ফাটে আট দিক।
অল্প শোকে কাতর যে কেউ।
তোর শোক, পাথর, অধিক;
তোর রাগ। পাষাণ, দে ঢেউ।
শিলাস্তরে অন্ধ ঢেউ দিই।"[১৮] ('বিচার' , 'অগ্রন্থিত কবিতা')

'লোকায়ত জীবন', 'চিরায়ত ইতিহাস' এবং পুরাণকে জড়িয়ে ধরেছে এ কবিতা। কবি বীতশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'হাজার বছরের বাংলা কবিতা'য় লোকায়ত জীবনভাবনা এবং চিরায়ত ইতিহাসচেতনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবি নিজেই বলেছেন তাঁর কবিতা 'লোকায়তজীবন' এবং 'চিরায়ত ইতিহাস'কে 'একটি ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় ছুঁয়ে যেতে চায়'।

লোকমুখে প্রচলিত একসময় ইন্দ্রের কাছ থেকে সিংহাসন উপহার হিসেবে পান মহারাজ বিক্রমাদিত্য। আদর্শ বিচারক ঐ সিংহাসনে বসে ন্যায্য বিচার করতেন। একসময় রাজা বিক্রমাদিত্য শালিবাহনের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। তারপর ঐ সিংহাসন মাটির তলায় চাপা পড়ে যায়। চাপা পড়া সিংহাসনের উপর জমতে থাকে পাথর মাটি। পরিণত হয় স্তূপে। এই স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আকাটমূর্খ রাখাল বালক সাবলীলভাবে বিচার করত। পরে ধারারাজ ভোজ এ খবর জানতে পারেন। পাথর মাটির স্তূপ সরিয়ে তিনি 'সিংহাসন উদ্ধার করেন'। সিংহাসনের গায়ে খোদাই করা বত্রিশটি পুতুল। ধারারাজ ভোজ সিংহাসনে বসতে উদ্যত হলে খোদাই করা বত্রিশটি পুতুল জীবন্ত হয় এবং এক একজন মহারাজ বিক্রমাদিত্য সম্পর্কে এক একটি গল্প বলে। তারপর উড়ে যায়। গল্পগুলির মূল বক্তব্য ছিল রাজা বিক্রমাদিত্য মানুষ হিসেবে কেমন চরিত্রের ছিলেন, রাজা হিসেবে প্রজাদের প্রতি কেমন কর্তব্য পালন করতেন, বিচারক ও শাসক হিসেবে কেমন শাসনকার্য চালাতেন।

১৪০০ খ্রীঃ ক্ষেমঙ্কর নামে এক জৈন লেখক গদ্যে বত্রিশ পুতুলের গল্প নিয়ে একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করেছিলেন। গল্পকার ক্ষেমঙ্কর গল্প কাহিনীগুলোকে সংক্ষেপে গদ্যে তুলে ধরেছিলেন, যার মূল ভিত্তি ছিল হয় লোকমুখ নয় পূর্বের কোনো রচনা। লোকগল্প যা আজও প্রত্যেকের ঘরে মুখে মুখে প্রচারিত তা রূপান্তরিত হয় মিথে। জনসাধারণ এখনও বিশ্বাস করেন বিচারকের আদর্শ বিচার ক্ষমতা, ন্যায় অন্যায় ধরতে পারার শক্তি আসনটিকে আজও ঘিরে রেখেছে।

আজ বিচারক পাষাণ, মানুষ অন্ধকার বিধানপ্রাপ্ত। রাজা বিক্রমাদিত্য যে বিধান দিতেন মূর্খ রাখাল যে বিধান দিত সে সব ছাড়িয়ে অন্ধমানুষ আজ বিধান দেবে : যদি ধান কেটে নিয়ে যায় তাহলে শান দেওয়া হেঁসোতে তার গলা কেটে দিতে। পাষাণ শিলাস্তরে ঢেউ তোলার যে স্পষ্ট ছবি আমরা দেখতে পাই তার পেছনে একসঙ্গে জড়িয়ে আছে পুরাণ, সাম্প্রতিক ইতিহাস এবং লোকায়তজীবন। কবি বাস্তবজীবনে মিথ আর লোকায়ত চেতনাকে উপস্থিত করেন নতুনভাবে। শিল্পী স্বাধীনতায় কবি বিশ্বাস করেন বলে পাঠককে সাহায্য করেন পুরাণ, ইতিহাস আর লোকায়তজীবনের ভেতর থেকে নতুনভাবে নিজের দেশকে আবিষ্কার করতে।

একই ভাবনা নিয়ে কবি রচনা করেন 'নতুন কবিতা'র 'যাত্রা' কবিতাটি। পুরাণ, লোকজীবন এবং ইতিহাস এখানে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। সমগ্র জগতের পুরানো যা

কিছু কবির দৃষ্টিতে নতুনভাবে আলোকিত :

"আমরা ফিরে এসেছি রামলীলার ময়দান থেকে,
রাবণপোড়া দেখে ফিরে এসেছি আমরা।
এক্কাচালকের গলায় শীতের রাতে
শুনেছি তুলসীদাসের ভজনের সুর;
মাঠের বাঁশির মতো তার গলা,
মাঠের ভিতর যেন একটাই বাড়ি :
সারানো যায় না ঘরদোরের মুখ,
বেমেরামত কলকব্জা।
আমার মাথা থেকে সরে গিয়েছে ওর হাত,
রামের হাত ধরে আছে সীতার মাথায় তালপাতা।
রোদ থেকে ছায়ায় ফিরেছি আমরা,
ছায়া থেকে শীত রাতের দিকে।
কারা ভিড় করে এসেছে চারপাইয়ের চারপাশে,
দশদিকে ছড়িয়ে আছে তারার আলো,
শোনা গেল মেঘ আর পাখার আলোড়ন।
হাঁসফাঁস ধুলো আর গরমের ভিতর থেকে
আমরা নিয়ে এসেছি সীতারামের পট।
বছরের পর বছর
আমরা বসে আছি মহাবীরের জন্য,
মহাবীরের মতো মেঘ, মহাবীরের মতো হাওয়া;
আমরা বসে আছি মহাবীরের জন্য,
বালিয়াড়িতে বসে আছি, বনের ভিতর, তারার আলোর নিচে।
পাল নড়ে উঠেছে একবার,
একবার হাল বসে গিয়েছে মাটির গভীরে,
উঠে এসেছে দুঃখের বীজ,
আমাদের মেয়ের নাম দেওয়া হয়নি এখনও।"[১৯]

('যাত্রা', 'নতুন কবিতা')

পুরাণ কথার নবনির্মাণ ঘটিয়েছেন কবি এ কবিতায়। এখানে আছে রামায়ণের অনুষঙ্গ। প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগ, মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের দিকে যাত্রা এ কবিতার। রামলীলার ময়দান, রাবণপোড়া, এক্কাচালকের গলায় তুলসীদাসের ভজনের সুর, রাম-সীতা, মহাবীর, সীতারামের পট — এই বিষয়গুলো কবিতার মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এখানে 'আমরা' অর্থাৎ সাম্প্রতিক মানুষগুলোর সমাজ এবং সংস্কৃতির কথা বলেছেন কবি। আমাদের সমাজে আমরা অপেক্ষা করি মহাবীরের জন্য, মহাবীরের মতো মেঘ ও হাওয়ার জন্য। কিন্তু মহাবীরের পরিবর্তে আমাদের সংসারে উঠে আসে 'দুঃখের বীজ'। 'দুঃখের বীজ' উঠে আসার সময় নড়ে উঠেছে পাল, মাটির গভীরে বসে যায় হাল। মেয়ে দুঃখের বীজের অন্য নাম। মেয়ে হয়ে জন্মানোর জন্য তার নাম রাখাও হয়নি :

'আমাদের মেয়ের নাম দেওয়া হয়নি এখনও।'

আধুনিকতার চরমতম সময়েও মেয়েদের অবহেলা করা হয়, তাদের পণ্য ভাবা হয়। অথচ মানুষ দেখছে :

'রামের হাত ধরে আছে সীতার মাথায় তালপাতা'।

'রোদ থেকে ছায়া', 'ছায়া থেকে শীত' রাতের দিকে আবার 'শীত থেকে ছায়া', 'ছায়া থেকে রোদের দিকে এ কবিতার এগিয়ে যাওয়া। এ যাত্রায় যুক্ত আমি, আমরা, এক্কাচালক, ভিড়, রামলীলার ময়দান, মহাবীর, সীতা, রাম। যুক্ত আবহমান কালের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবির অন্তরের সংস্কৃতি, যে সংস্কৃতি কোনো তত্ত্বদর্শন না চাপিয়ে পরস্পরবিরোধী চিত্রকল্পগুলিকে পাশাপাশি রাখতে চায়। পাঠক শুনছেন রামায়ণ, অনুভব করছেন রামলীলার ময়দানে রাবণের পুড়ে যাওয়াকে। যৌথ সংস্কৃতি, প্রাচীন ও বর্তমানের মিলনও পাঠক অনুভব করছেন।

মানবজীবনের গদ্য আর কবিতা কেমন একসঙ্গে আবর্তের মধ্যে অবস্থান করে তা এই কবিতায় কবি দেখিয়েছেন নতুনভাবে। কবিতায় একদিকে ঘনিয়ে উঠেছে খর তিরস্কার :

'হাঁসফাঁস ধুলো আর গরমে'র মতো,

অন্যদিকে প্রশান্তি :

'দশদিক ছড়িয়ে আছে তারার আলো'।

এখানে অবিরাম ঘুরে চলেছে পুরাণ, লোকায়ত জীবন এবং ইতিহাসচেতনা। কবি এ

কবিতায় 'দল, সমাজ, বিশ্বাস, আদর্শ, পুরাণ এবং সমগ্র মানবজগৎ' নিয়ে নতুন পৃথিবী গড়তে চেয়েছেন।

আধুনিক পরবর্তী ভাবনায় কবি লোকায়ত শিল্পকে লোকায়ত থেকে উজিয়ে দিয়েছেন পরিশীলিত শিল্পে। 'অন্যযুগের সখা'র 'তরুণী' কবিতার শেষাংশে দেখি :

"শেকড়ের নীচে যক্ষের বাড়ি ছিল :
গ্রামীণ কবিরা সারাদিন লোকগাথা
গেয়ে ঘরে গেল : কে তুমি গোপন আলো
লুকোনো রত্ন... ও যুবক জানে না তা।"[২০] ('তরুণী', 'অন্যযুগের সখা')

লোকগাথায় যক্ষের প্রসঙ্গ আছে। আজকের দিনে জনসাধারণের কাছে যক্ষের কাহিনী একটি মিথ। কবি বীতশোক ভট্টাচার্য এই মিথকে মনে করেন আমাদের সাহিত্য শিল্পে 'গোপন আলো', 'লুকানো রত্ন'। 'যক্ষ' শব্দের অর্থ দুটি – ক) বাংলা যক বা জক খ) কালিদাসের যক্ষ।

'সংস্কৃত যক্ষ > পালি যক্খ > প্রাকৃত জক্খ > বাংলা যক বা জক'। ধনশালী কৃপণ ব্যক্তিকে বলে যক্ষ। মাটির নীচে এই ধন সঞ্চিত রেখে ঐ কৃপণ ব্যক্তি মারা যান। মৃত্যুর পর পাহারা দেন যক্ষ হয়ে।

বিরহী যক্ষের প্রসঙ্গ আছে কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে। কালিদাস এই বিরহী যক্ষকে নির্মাণ করেন লোকায়ত যক্ষের গল্প অবলম্বনে। এই কবিতার মধ্য থেকে খুঁজে পাই 'শেকড়', 'লুকানো রত্ন', 'গোপন আলো' ইত্যাদি শব্দগুলি। এই শব্দগুলি ইঙ্গিত করে যক্ষের প্রসঙ্গ। আমাদের ঐতিহ্যকে ইঙ্গিত করে 'শেকড়' শব্দটি। গ্রামীণ শিল্প ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়েছে সংস্কৃত শিল্পে। লোকায়ত শিল্প জক হয়ে উঠেছে কবি কালিদাসের 'পরিশীলিত যক্ষ'। লোকগাথার অনুবাদ বা অনুসৃষ্টি থেকে যায় পরিশীলিত শিল্পে' তা আধুনিক কবিতা এই ঐতিহ্য স্বীকার করুক বা না করুক।

গ্রামীণ সংস্কৃতি, লোকজীবন এবং লোকশিক্ষাকে কেন্দ্র করে রচিত 'এসেছি জলের কাছে' কবিতা পুস্তিকার 'বিধান' কবিতাটি :

সেদিন বিকেলে মরে এসেছিলো আলো
হেঁটে হেঁটে আমি গিয়েছি পাড়ার শেষে
দেখেছি দাওয়ায় দাঁড়ানো মাটির মেয়ে

মুখ নেই তার চোখ মুখ কিছু নেই
ঝরে গেছে সব ধুয়ে মুছে ক্ষয়ে গেছে
আঁচল ধরেছে খর্বুটে এক শিশু
হাত নেই তার কুঠ দুটো হাতই নেই

বুক চাপাপড়া ভয়ে দম আটকাল
থমকে দাঁড়াই, হাঁপ ছাড়ি কাছে এসে
চোখ নেই তবু মেয়েটি রয়েছে চেয়ে
হাত নেই তবু আঁচলটি হাতে সেই
এখন এমন ঘুমে পাওয়া গ্রামদেশে
মেয়েটি হয়েছে প্রতিমার মতো ঋজু
ছেলেটা মূর্ত হয়ে ক্রমে উঠছেই

ছায়ার মূর্তি আশেপাশে মাটিকালো
ঘনিয়ে এসেছে দরজায় ওরা কে যে
দেওয়ালের কাছে কাদের দেখতে পেয়ে
ঠোঁট নেই তবু মেয়েটি বলল, এই
তুমি পুরোহিত পুথি খুলে দাও এসে
আমাকে চিতায় তুলে দাও, শুনে শিশু
আমার দিকেই হাত তুলে ছুটে এল।''[২১]

('বিধান','এসেছি জলের কাছে')

এই কবিতায় যে জীবন উঠে আসে তা পুরোপুরি লোকায়ত। আবার এ কবিতার ভাষাও লোকায়ত। যেমন — 'মাটির মেয়ে', 'কুঠ', 'হাঁপ', 'পাড়ার শেষে', 'হেঁটে হেঁটে' প্রভৃতি শব্দগুলি 'জীবনের ঘনিষ্ঠতম ভাষা'। গ্রামের সরল মানুষ প্রতিদিন সহজভাবে স্বাভাবিকভাবে এরকম ভাষাতেই কথা বলেন। গোপাল হালদার এ বিষয়ে অসাধারণ মন্তব্য প্রকাশ করেন ।[২২]

'বিধান' শব্দের যেমন একাধিক অর্থ আছে তেমনি 'বিধান' কবিতাটি একটি নির্দিষ্ট লক্ষণে

চিহ্নিত নয়, আমাদের মানবজীবনের মতো সমস্ত লক্ষণ এখানে অবিরাম ঘুরছে। ক্ষয়ে যাওয়া তৃতীয় বিশ্বের সার্বিক দুরবস্থার চিত্র এ কবিতার মধ্যে উপস্থিত। উপস্থিত কুষ্ঠরোগাক্রান্ত জীবনের ছবি, ম্যাজিক বা জাদুর প্রসঙ্গ, লোকায়তিক জীবন, পুরোহিতের অনুষঙ্গে পুথির প্রসঙ্গ ইত্যাদি। গ্রামদেশের মানুষ, তাদের দারিদ্রতা, নির্বিকার থেকে এক একটি পরিবারের বিধি বা নিয়ম মেনে নেওয়া, কখনো মেনে না নেওয়া, মৃত্যুর দিকে গড়িয়ে যাওয়া বিশ্বের এইসব দুরবস্থাকে কবি তাঁর রচনায় অসাধারণ করে উপস্থাপিত করেছেন। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের রাঢ়দেশে কুষ্ঠরোগ আছে। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য এর নজির রেখেছে। গ্রাম সমাজে এবং নগরের মানুষের মনে কুষ্ঠরোগ আজও আতঙ্ক সৃষ্টি করে। রক্ষণশীল মানুষ মানবিকতাকে বিসর্জন দিয়ে কুষ্ঠরোগীদের স্থানান্তরিত করে। লোকজন তখন শিক্ষাকে পেছনে ফেলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সবদেশেই কুষ্ঠরোগ আছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণে আসে আফ্রিকার মানুষগুলোর কথা। আফ্রিকার ল্যাম্বারেণেতে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মানুষগুলোকে বাঁচানোর জন্য অ্যালবার্ট সোয়াইৎসার নির্মাণ করেছিলেন কুষ্ঠাশ্রম। সেখানে 'সিসি' (Tsetse) মাছির কামড়ে মানুষ অদ্ভুতভাবে ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে।

ভারতবর্ষে ম্যাজিক বা জাদু ছিল আগে থেকেই। চর্যাকবি ঢেন্ঢণ পা'র লেখাতে আছে এমন ম্যাজিক যে বলদ বাছুর দেয়, গাভি বাছুর দিতে পারে না।[২২] বাউল গানেও এমন ম্যাজিকের প্রসঙ্গ আছে। 'বিধান' কবিতাতেও দেখি আশ্চর্য জাদু — চোখ নেই তবু চেয়ে আছে, হাত নেই তবু আঁচল ধরে আছে, ঠোঁট নেই তবু কথা বলছে। এ যেন বাস্তব জগৎ থেকে স্বপ্নের জগতের দিকে যাত্রা। ম্যাজিসিয়ানরা যেমন রহস্যের সন্ধান করার জন্য সূত্র খোঁজেন কবি বীতশোক ভট্টাচার্যও একইভাবে তাঁর কবিতাতে লোকশিল্প ও লোকশিক্ষাকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন গোপন সূত্রের সন্ধান করে।

কবি লোকায়তজীবনে নারী ও প্রতিমাকে প্রায় এক করে দেখিয়েছেন কবিতায় :

'মেয়েটি হয়েছে প্রতিমার মতো ঋজু'।

তাঁর অন্যান্য কবিতাতেও নারী ও প্রতিমার প্রসঙ্গ একসঙ্গে আছে। মাটি দিয়ে গড়া হয় প্রতিমা। নারী মাটির মতো সহিষ্ণু এবং লৌকিক। শুধু নারী নয়, সহজ, সরল সাধারণ মানুষ ছেলেটিও মাটির মতো নরম ও সহিষ্ণু। তাই ছেলেটি হয়ে উঠেছে মূর্ত থেকে মূর্তি।

'ঝরে গেছে সব ধুয়ে মুছে ক্ষয়ে গেছে' —

মাটির প্রতিমা ধুয়ে যায় জলে, মানুষ গলে কুষ্ঠ রোগে। প্রকৃতির নিয়মে বা অসুখে সব ধুয়ে যায়, ক্ষয়ে যায়। এ যেন কবিতার জীবন থেকে মৃত্যুর দিকে যাওয়া। আবার মৃত্যু থেকে জীবনের দিকেও ফিরে আসার কথা বলেছে 'প্রতিমার মতো ঋজু' মেয়েটি :

"...এই
তুমি পুরোহিত পুথি খুলে দাও এসে
আমাকে চিতায় তুলে দাও,..."

চিতায় তুলে দেওয়ার কথা শুনে শিশু হাত তুলে ছুটে আসে। অসহায়ভাবে মেনে নিতে না পেরে হাত তুলে প্রতিবাদ করে।

শিল্প এবং জীবন প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে সমানভাবে অবস্থিত। পুথি শব্দটির সূত্রে উজিয়ে যেতে পারি প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিল্পে। পুথি শব্দটি এসেছে পুরোহিতের অনুষঙ্গে। পুরোহিত পাঁজি-পুথি নিয়ে পূজা অর্চনা করেন। পুরোহিততন্ত্রের ভিতর দিয়ে আসে বেদ এর প্রসঙ্গ। তবে বেদ অর্থে যে কিছু মন্ত্র বোঝায় এখানে কিন্তু তা নয়। শিল্প এবং জীবনের টানাপোড়েনে কবি একইসঙ্গে আবিষ্কার করেন 'দার্শনিক বিশ্ববীক্ষা এবং শিল্পের জাদু'।

সরল ও জটিল দুই জীবনের কথাই কবিতার মধ্যে কবি বলেছেন :

'...দরজায় ওরা কে যে
দেওয়ালের কাছে কাদের দেখতে পেয়ে' —

বাক্যদুটিতে 'কে যে', 'কাদের' শব্দগুলি অনির্দিষ্ট, জীবনের জটিল দিককে বুঝিয়ে দেয়। কোনো কিছুই নির্দিষ্ট নয়। আবার 'মেয়ে', 'শিশু', পুরোহিত শ্রেণি জীবনের সরল দিককে প্রকাশ করে।

কবিতাটি এগিয়ে গেছে একটির পর একটি ঘটনা ঘটতে ঘটতে। এ কবিতা সর্বব্যাপক। কবিতাটি আমাদের নিয়ে যায় স্তব্ধতার জগতে, নিয়ে যায় লোকায়তিক জীবনের ক্যানভাসে, যেখানে গ্রামীণ জীবনের সমস্ত অন্ধকার আমাদের চোখে সয়ে গেছে।

কবি লোকায়ত বাংলাকে মন্দিরের টেরাকোটার মধ্য দিয়ে চিনেছেন। মার্বেল পাথরের মূর্তি কবির মনে দাগ কাটতে পারে না। বাংলাভাষা এবং বাংলাসাহিত্যের অনুসন্ধান করেছেন নিখুঁতভাবে। তাঁর কবিতায় তাই উঠে এসেছে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনচর্যা, বাংলার

লোকজীবন ও লোকশিল্প। তিনি তাঁর শিল্পের সারবস্তু খুঁজে বেড়িয়েছেন মন্দিরের টেরাকোটার মধ্য দিয়ে। 'পোড়ামাটির মন্দিরে উৎকীর্ণ' শিল্পকে কবি মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন আজকের জীবনধারায় :

"তোমায় দেখাই পোড়ামাটির কাজ।
তোমার হাসি পোড়াখাওয়া এই মাটি :
মাটি সহজ, সরল তোমার হাসি।
ভেঙেছে মাটি, গিয়েছে হাসি থেমে।
দাঁড়াও তুমি দাঁড়িয়ে থাকো আজ
দেখব আমি চাতাল থেকে নেমে
মন্দিরের এই গড়ন খুঁটিনাটি;
মাটির দেওয়াল ভরাট টেরাকোটায়।
তুমি কেন হঠাৎ যেন রাজি
এই কবিতার ভিতর গেয়ে ওঠায়।

মন্দিরের পাশের গাছে পাখি,
শেষ হলো না কাকলি দিন শেষে।
গভীর থেকে এনেছে এ কী বাণী
সূর্যাস্তের দিকের এক নদী।
সময় হলো সময়ে আসা ক্ষতি।
দু-হাঁটু বুকে গুটিয়ে শোয়া জানি।"[২৪] ('মন্দির', 'এসেছি জলের কাছে')

'ছৌ' নাচের ভূমিস্পর্শ মুদ্রা এঁকেছেন কবি তাঁর কবিতায় যা মানবসভ্যতার মূল লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যকে স্মরণ করায়:

"এসো খুঁজে নিই আমরা শূণ্যতাকে :
এই বলে ঘরে সেই দিন ভোররাতে
তুমি দুটো হাতে ধরেছ এ মুখটাকে।
আমিও দুহাতে ভরেছি তোমার মুখ।
কেন কাগজের মুখোশের মত লাগে;

ছুঁয়ে ছেনে দেখি তোমার চিবুক ভুরু।
আমাকে বলেছ : মুখ ভারি কেন এত :
এখনি কি হবে গম্ভীরা নাচ শুরু।

অমনি শুনেছি ধামসার গুরু গুরু।
দাঁড়ানো গণেশ ছুটে এসে নামে মাঠে।
পুরুষ, নারীরা শিশু নিয়ে কোলে কাঁখে।
রাম আর সীতা দুজনেই ছৌ নাচে

ভালো অভিনয় করেছে সে-রাতে খুব।
হইচই হাসি শানাই কান্না ঢাকে
আমাদের গলা চাপা পড়ে গেল কত।
দুজন দেখেছি দুজনের পুরো মুখ।"[২৫] ('ছৌ', 'এসেছি জলের কাছে')

কবিতাটি রচিত চার স্তবকে। প্রত্যেক স্তবকের পংক্তিসংখ্যা চার। ছৌ পুরুলিয়ার লোকনৃত্য। মুখ থেকে মুখোশ আবার মুখোশ থেকে মুখে ফিরে এসেছে এ কবিতা। শিবকে কেন্দ্র করে বাংলার বিভিন্ন স্থানে চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন উৎসব। এই উৎসব অনুষ্ঠানগুলি হল গাজন, চড়ক, গম্ভীরা, সঙের গান এবং নীলের পুজো। লোকসমাজ শিব আরাধনার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয় চৈত্রমাসকে। কারণ চৈত্র মাস বর্ষ শেষের মাস। আবার নতুন বছরের আবির্ভাব ধ্বনিত হয় এই চৈত্র মাসেই।

উত্তরবাংলায় বিশেষ করে মালদহ জেলায় গাজন উৎসবের নাম গম্ভীরা। সংস্কৃতে একে বলে 'কালাক রুদ্র পূজা'। অর্থাৎ কাল সদৃশ ভীষ অর্ক বা সূর্যের পূজা, শিব বা গৌরীর আনুষ্ঠানিক পুজো শেষ হলে গ্রামবাসীরা একটুকরো পাথর ('গাজনে শিব') পালকির মধ্যে বসিয়ে বা কাঁধে নিয়ে শোভাযাত্রা বের করে। এক গ্রামের শিবমন্দির থেকে অন্য গ্রামের শিবমন্দিরে যাওয়ার সময় তারা নাচ করে, গান করে এবং ছড়া কাটে। গান এবং ছড়ার মধ্য দিয়ে শিবের মাহাত্ম্যের বিষয় শুনতে পাওয়া যায়। এই শোভাযাত্রায় যারা সঙ্গী হয় তারা ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব যে যার ইচ্ছেমত সাজে। অনেকে আবার মুখোশ পরে। কবি বীতশোক

ভট্টাচার্যও তাঁর কবিতায় মুখ থেকে মুখোশের প্রসঙ্গ এনেছেন।

শিবের আরেক নাম 'গম্ভীর'। 'আ' যুক্ত হয়ে 'গম্ভীরা'[২৬] হয়েছে শিব বিষয়ক গান। নিম্নবর্ণের মানুষেরা চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে বিভিন্নভাবে শিবের আরাধনা করেন :

সারা চৈত্রমাসজুড়ে নিম্নবর্গের মানুষ (হিন্দু-মুসলমান-চাষী) নির্দিষ্ট একটি জায়গায় মিলিত হয়। তাদের জীবনের নানা অভিযোগ-অভাব-সমস্যা-সংকট-অনাচার-অত্যাচার ইত্যাদি যন্ত্রণার কাহিনীকে নাট্যাকারে অভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরেন শিবের কাছে। প্রায় দু-তিনঘণ্টা সময় ধরে এ অভিনয় চলে। এ অভিনয়ের উদ্দেশ্য জীবনযন্ত্রণার প্রতিকার চাওয়া। বছরের অন্য সময়ও গম্ভীরার দল নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে অভিনয় প্রদর্শন করেন।

এ কবিতায় কবি ছৌ নাচের মধ্য দিয়ে রাম-সীতার অভিনয়ের কথা বলেছেন। বলেছেন 'ধামসার গুরু গুরু' শব্দ শোনার পরেই মাঠে গণেশের নাচ শুরুর কথা। গ্রামের মানুষেরা — পুরুষ, নারী শিশুকে কোলে নিয়ে এ নাচ, অভিনয় দেখেন। বিচার করেন অভিনয়ের ভালো-মন্দের দিক। মুখোশের আড়ালে মুখের, ভালো অভিনয়ের আড়ালে বাস্তব যন্ত্রণাময় জীবন, হইচই হাসির পরিবর্তে শানাইয়ের সুরের মতো বিষাদময় কান্না 'ছৌ' কবিতাকে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে। ব্যক্তি যন্ত্রণা নৈর্ব্যক্তিক হয়ে গেছে। মুখোশের পরিবর্তে সত্যিকারের আসল মুখ দেখেছে দুজন দুজনের। এখানে গ্রামীণ মানুষের, তাদের আচার ও সংস্কৃতির লোকায়তিক ভাবনার, চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের উৎসবের, সেই উদ্দেশ্যে ছৌ নাচের 'ভূমিস্পর্শ' মুদ্রার ইঙ্গিতে কবিতাটি হয়ে উঠেছে বহুত্ববাদী।

লোকসমাজ শিব আরাধনার ক্ষেত্রে চৈত্র মাসকে যেমন প্রাধান্য দেয় একইভাবে বাংলার বারো মাসের তের পার্বণের মধ্যে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক ও উত্তেজনাপূর্ণ পার্বণ চড়কও হয় চৈত্র মাসে। 'জলের তিলক' গ্রন্থের 'সে-দিন' কবিতায় কবি চড়কমেলা দেখার কথা বলেছেন :

> "বলবে : 'চড়কমেলা দেখে যাও একদিন থেকে'।
> বিকেলে গুমোট ভেঙে হাওয়া দেবে। গোধূলির আভা
> মুছে গেলে দেখা যাবে আলপথ, বালি আরও সাদা হয়ে যাওয়া।
> যারা ফিরবে এইবার শান্তিনাথ মন্দিরের থেকে
>
> এ ওর পেছনে হাঁটবে, দেখতে দেখতে ঢুকে পড়বে গ্রামে।

ফের ফাঁকা হবে মাঠ। তারা ফুটতে থাকবে আকাশে।" [২৭]

....." ('সে-দিন', 'জলের তিলক')

কবিতায় কবি গ্রাম দেখতে আসা, গ্রামের মধ্যেকার জীবন দেখতে আসার কথা বলেছেন। গ্রামজীবন, লোকজীবনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও ধারা। চৈত্র মাসে হয় চড়কমেলা। 'চড়ক' হল শিবের গাজন। মহোৎসবে চড়কগাছে ঝুলে চক্রভ্রমণ। উঁচু বাঁশ বা খুঁটির মাথায় প্রতি চৈত্র সংক্রান্তিতে দাঁড়িয়ে আকারে বাঁধা দণ্ডে ঘূর্ণন উৎসব। 'চড়ক' এর ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত 'চক্র' শব্দে। সংস্কৃত চক্র > চকর (স্বরাগমে) > চরক বা চড়ক > (বর্ণ বিপর্যয়ে)। এর অর্থ চক্রাকারে ঘোরা বা পাক খাওয়া। বর্ষচক্র ঘুরে হয় বর্ষশেষ ও নববর্ষারম্ভ। সারাবছরের জমানো গ্লানি রোগ-শোক-দুঃখ শেষ হয়ে নতুন বছরের সুস্থ জীবন চেতনায় উত্তরণের জন্য লোকসমাজে এক বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়। লোকবিশ্বাস মানুষের মধ্যে কাজ করে। কোলকাতায় এবং পশ্চিমবঙ্গের নানা অংশে চড়কের মেলায় অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ। চৈত্রমাসের শেষ সপ্তাহ ধরে চড়কপূজার উৎসব পালিত হয়। শেষ দিনে ভক্তেরা বিশেষভাবে সমাগত হন শিবের কাছে। কবি বীতশোক ভট্টাচার্যও তাঁর কবিতাতে 'চড়কমেলা', শান্তিনাথ মন্দিরে'র কথা বলেছেন। 'মেলা', মন্দির থেকে ফিরে 'এ-ওর পেছনে' হাঁটতে হাঁটতে মানুষজন পৌঁছে যাবেন গ্রামে। লোকায়ত ধর্ম এবং লোকায়ত বিশ্বাস কবিতার মধ্যে কবি চারিয়ে দিয়েছেন।

কেবল চড়কমেলা নয় সাধারণ মেলার কথাও তাঁর কবিতায় বার বার ফিরে এসেছে। এ মেলা বাংলার লোকায়ত মেলা। যেখানে সকলে একসঙ্গে এসে মিলিত হয় এবং নিজেকে মেলে ধরার, প্রকাশ করার সুযোগ পায়। 'যাত্রা' কবিতায় এ মেলার প্রসঙ্গ আছে :

"পাতার ওপর রোদ পড়েছে, পাতার ওপরে ছায়া;
মাটির ওপর নকশা আছে মেলা :
গাঁ পেরিয়ে মেলায় এসে মেয়েরা যেন আহা
গলা জড়িয়ে কাঁদছে বিকেলবেলা।

কাঁপছে ছায়া, থামবে কেঁপে শেষ বিকেলের আলো;
অন্ধকারে নদীতে আর নদীতে হবে দেখা;

অন্ধকারে বোনকে ছেড়ে, বোনরে কাঁদিস না লো।
একলা চলে শালের বন ঝিঁঝির ডাকে একা।"[২৭] ('যাত্রা', 'দ্বিরাগমন')

লোকায়ত বাংলাদেশের ছবিকে এ কবিতা মেলে ধরে। এখানে শিল্পি যে ছবি এঁকেছেন তাতে জানা, চেনা, দ্যাখার মতো সাধারণ বিষয়গুলো হয়ে উঠেছে অসাধারণ। কবি পারিবারিক ভালোবাসার মায়া-মমতার স্মৃতি এখানে তুলে ধরেছেন।

পাতার ওপর রোদ আর ছায়া পড়ে একসঙ্গে মিলে গেছে পাতা, রোদ ও ছায়া। সেখান থেকে যে ছায়া বেরিয়ে এসেছে তা মাটির ওপর নক্‌শা মেলে দিয়েছে। প্রকৃতির তৈরি এ নক্‌শা ঘনঘন হাওয়ায় কেঁপে ওঠে। পরের পংক্তিতে এ নক্‌শা হয়ে উঠেছে যেন জীবন্ত ছবি — মেয়েরা গ্রাম পেরিয়ে মেলায় এসে সকলে একসঙ্গে মিলিত হয়। এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে গলা জড়িয়ে কাঁদে অথবা বিকেলবেলা কাঁদে আলো আর ছায়ার গলা জড়িয়ে ধরে। কারণ একটু পরেই নামবে সন্ধ্যা। বিকেলবেলা সন্ধ্যার অন্ধকারে মারা পড়বে। বিয়ের পর প্রায় মেয়েই আর বাপের বাড়ি ফিরে আসে না। কেননা আর্থিক সমস্যা। অথচ প্রায় সময়ই যন্ত্রণায় ভরে যায় তাদের মন। বহুকাল পর দূরগ্রামের কোনো মেলায় পরিচিতদের সাথে দেখা হলে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেয় প্রত্যেককে। আবেগে কান্না বেরিয়ে এসে। আবার মনের কথা খুলেও বলতে পারে। তাই মেলা যেমন একসঙ্গে মানুষকে মিলিত করে একইভাবে মনের বাঁধনও খুলে দেয়। কবিতাটির যাত্রা উভয়দিকে — দিনের থেকে রাতের আবার বন্ধন থেকে মুক্তির। হারানো থেকে ফিরে পাওয়া আবার হারিয়ে যাওয়া।

অন্ধকারে নদীর সঙ্গে নদীর দেখা হয়। অন্ধকারে বোনকে ছেড়ে বোন কাঁদে। নারী আর নদী সমান অর্থ বহন করে। নদীর সঙ্গে নদীর মিল হলেও অন্ধকারের প্রসঙ্গ মিলকে নিয়ে যায় অন্যদিকে — 'বোনকে ছেড়ে' অর্থাৎ হারিয়ে যাওয়ার দিকে। ঝিঁঝির ডাকে শালবন একা এগিয়ে যায়। শালগাছের সঙ্গে মানুষের তুলনা করেছেন। সেইসব মেয়ের কথা বলেছেন যারা জঙ্গলের মতো কাঁদতে কাঁদতে একা বড় হয়ে ওঠে।

এ-কবিতার গঠনে আছে ছড়ার আঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের ছড়ার সঙ্গে এ কবিতার কিছু মিল পাওয়া যায়। কবি বীতশোক ভট্টাচার্য 'ছড়ার গঠন' সম্পর্কে আলোচনা কালে বলেন :

"ছড়ায় নিরর্থক ধ্বনি সমবায় নিয়ে যেমন পঙ্‌ক্তি গড়ে ওঠে তেমনি আর এক ধরনের ছড়া

আছে যেখানে অর্থবহ পংক্তি আছে। এ সব পংক্তি একাগ্র, সরল, সংহত ও বিবৃতিময়। অর্থাৎ ছড়া হয়তো সামগ্রিকভাবে অসংলগ্ন মনে হতে পারে কিন্তু একক পংক্তির মধ্যে ব্যাকরণ ও যুক্তিনিষ্ঠ অন্বয় থাকে।"[২৯]

কবিতার প্রতিটি পংক্তিতে চারিয়ে গেছে আদিম মানুষ ও লোকমানসের বীজ শিকড়। এখানে একদিকে আছে জীবনের 'প্রাচুর্যময়তা'। অন্যদিকে নিঃসঙ্গতা, জীবন ও মৃত্যু। বিকেলবেলার আলো তারপরেই অন্ধকার, অন্ধকারে নদীর সঙ্গে নদীর মিল। বোনকে ছেড়ে বোনের কান্না অর্থাৎ একদিকে মিলন ও অন্যদিকে বিরহ। শালবন, ঝিঁঝির ডাকের যাত্রা নিঃসঙ্গ। এই নিঃসঙ্গতা কবিতায় একক নয়, ছড়ার চরিত্রগুলোর মতো মানুষের সমষ্টির সঙ্গে আছে ব্যক্তির মিলে যাওয়া।

আদিবাসী মেয়েরা মাথায় মধুক ফুল নিয়ে গান গাইতে গাইতে আসে মেলাতে। 'মেলা'র বিশেষ আকর্ষণ মোরগ লড়াই তারা দেখে যা লোকসংস্কৃতিকে, লোকায়তিক জীবনকে তুলে ধরে :

"তোমার ভেতর মেলা বসে গেছে তাই
মাথায় মধুক ফুল আদিবাসী মেয়ে
দুপুরে আসছে দ্যাখো বনপার হয়ে গান গেয়ে;
দ্যাখো গোঁড় যুবকের মোরগ লড়াই।"[৩০] ('মেলা', 'দ্বিরাগমন')

কবি তাঁর কবিতা এ সবের মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলার জীবনের পরিসরে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চান।

কবি বীতশোক ভট্টাচার্য তাঁর শিল্পের সারবস্তু অন্বেষণ করেছেন লোকায়ত ইতিহাস থেকে। 'বর্গভীমা মন্দির', 'শান্তিনাথ মন্দির' মন্দিরের টেরাকোটা কবির কবিতার প্রেরণার উৎস :

"পালটে গেছে বর্গভীমা মন্দিরের রূপ।
বদলায়নি বাইরের বুড়ি।
যেমন পুতুল নিয়ে বসে থাকে, সে-রকম আছে।
গায়ের ময়লা দিয়ে গড়া এই পুতুল তোমার ?
জানতে চায় না কেউ, দুই কবিবন্ধু হেঁটে পার হয়।
নিবেদিতা বলেছেন : ক্রিট দ্বীপে পাওয়া যেত
এমন পুতুল —

বলে, আর হেঁটে যায় বন্ধুরা দু'জন।

বুড়িকে দেখে না কেউ : এ কি সেই জরতী বিধবা ?

মহাভারতের ব্যাস — তাকে তুমি ছলনা করেছ ?

এ কথা শোনে না বুড়ি। ঘুম পায় তার, ঢুল আসে।"[৩১] ('মন্দির' (দেবী), 'জলের তিলক')

তিল তিল করে গায়ের ময়লা দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল তিলোত্তমা। মধুসূদন দত্ত লিখেছিলেন 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য। সেই তিলোত্তমা সুন্দ-উপসুন্দবধের কারণ হয়েছে। যেমন তিলোত্তমাকে গড়ে তুলেছিলেন দেবতা তেমনি আমাদের দেশের দরিদ্র মানুষেরা নিজের কান্না, ঘাম মিশিয়ে তৈরি করেন সুন্দর সুন্দর পুতুল। এসব পুতুল ছলন হিসেবে ব্যবহার করা হয়, আবার এগুলো তাদের রুজি-রোজগারেরও জায়গা। পুতুল গুলো দৈনিক অন্ন সংস্থানের আধার। মন্দিরের রূপ বদলায় কিন্তু বাইরের ভিখিরী দরিদ্র মানুষের চেহারা একই থাকে। ভগিনী নিবেদিতা গ্রীসের ক্রীট দ্বীপেও এমন পুতুল বিক্রী হতে দেখেছেন। তাই পুতুল এবং পুতুলের কারিগর কেবল বর্গভীমা মন্দিরে সীমাবদ্ধ নেই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষেরা এবং বিক্রেতা বুড়ি সারা পৃথিবী জুড়েই ছড়িয়ে আছেন। রোগ ব্যাধিতে ভোগে এই মানুষগুলো পৃথিবী থেকে হারিয়ে যায়। তাই ব্যাসদেব মহাভারতে যে জরতীর চেহারা এঁকেছেন সে চেহারার রূপ পাওয়া যায় মন্দিরের দাওয়ায় বসা বুড়ির মধ্যে। 'বিষ্ণুপুরাণ' গ্রন্থের 'অংশ-৩, 'অধ্যায়-৩' এ ব্যাসদেবের প্রসঙ্গ আছে। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যেও ব্যাস, তার কাশীনির্মাণ এবং বৃদ্ধাজরতীর গল্প আছে। এখানে যে বৃদ্ধার রূপ আঁকা হয়েছে তার আদিরূপ আছে মহাভারতে এবং ব্যাসদেব সেই জরতিকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন। তিনি কোনদিন জ্বরাগ্রস্ত হননি। জরতি ছলনা করেও ব্যাসদেবকে জ্বরাগ্রস্ত করতে পারে না। ব্যাসদেব জরতিকে উপেক্ষা করেন। আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ হবে জ্বরাকে এড়িয়ে চলা। মানুষ এমন হয়ে উঠবে এটাই কবির বিশ্বাস। এ বিশ্বাস এসেছে গ্রামের মানুষ, তাদের আচার-সংস্কৃতি এবং লোকায়তিক জীবন থেকে।

এই সমকালে গ্রামজীবন, লোকায়ত ভাবনা এবং লোকসংস্কৃতি নিয়ে কবিতা লিখেছেন অমিতাভ গুপ্ত, অঞ্জন সেন, দেবদাস আচার্য, নির্মল হালদার। কিন্তু তাদের কবিতায় ভারততত্ত্ববিদ্যা অত গূঢ় ভাবে চারিয়ে যায় নি। পক্ষান্তরে অমিতাভ গুপ্ত বা অঞ্জন সেনের কবিতায় বিষয়টি স্পষ্ট এবং অনেকটা প্রচার হয়ে উঠেছে:

‘কালোবউ জানে শুধু মেয়েরাই মাটির পুতুল
গরীব ও বোকা বাবা ধাতু দিয়ে তাকে
মুড়েজুড়ে পাঠিয়েছে শ্বশুরের ঘরে
শুশুরের ছেলে তাকে কালরাতে চুপিচুপি বলেছিল
ঘরে ঢের কেরোসিন আছে’।[৩২]

(‘গান্ধারী’, ‘মাতা ও মৃত্তিকা’)

কবিতায় কেরোসিনের স্পষ্ট উচ্চারণ রহস্য এবং নৈর্জন্যকে অনাবশ্যক মনে করে। অনুরূপ অঞ্জন সেনের ‘ঘর’ কবিতাটিও:

‘সাত সমুদ্র তেরো নদী নিয়ে এক সমুদ্র
জল শুধু জল পানি তান্নি
আছড়ে আছড়ে ঢেউ ফিরে যাচ্ছে
একটা পাতা পড়ল দুঃখের থেকে
আরো একটা পাতা আরো আরো
পাতারা ঝিনুক হয়ে যাচ্ছে
মনে পড়ল ঘরের কথা
কেমন করে ঘর বাহির হয়ে যাচ্ছে
বাহির হয়ে যাচ্ছে ঘর
জল গান করে যাচ্ছে হাওয়ার সঙ্গতে
ঘরের মধ্যে বৃক্ষ
পাতা ভাসছে অন্য জলে’।

(‘ঘর’ ,অঞ্জন সেন)

এখানে ‘ঘর’ গ্রামীণ মানুষের দুঃখ কষ্ট নিয়ে উপস্থিত হলেও দার্শনিকতায় অস্থির। বরং তুলনায় গ্রামীণ বাংলা, তার লোকায়ত জীবন এবং সংস্কৃতিকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন কবি নির্মল হালদার। ‘রামধনু’ কবিতাটি এদিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

‘‘ওই যে রামধনু আসলে কোনো এক দেবীর গলার হার দেবতারা ফেলে
গেছে। যা আমি ইচ্ছে করলেই পরতে পারি কিন্তু পরব না।

ছোটোবেলায় আমার গলায় মাদুলি চিবিয়ে চিবিয়ে নষ্ট করেছি, রামধনু
পরলে যদি চিবিয়ে ফেলি, কোত্থেকে শিখব রঙের লহরি।''[৩৩]

('রামধনু' ,'আরেক ভুবন')

এঁদের থেকে বীতশোক ভট্টাচার্যের কবিতা সুদূর।

আসলে কবি বীতশোক ভট্টাচার্য বিশেষ কোনো গ্রন্থিতে আবদ্ধ হতে চান না। তাই তিনি নিগ্রন্থীদের মতো নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেন 'নির্গ্রন্থ' কবিতায় :

"এককালে মস্করী গোশালের শিষ্য ছিলাম আমি।
তাঁর মতো নিয়তিবাদী হতে পারলাম না, এই আমার নিয়তি।
ভালো লাগল না নগ্ন আজীবিকদের সঙ্গে আমৃত্যু মশকরা।

হলুদ ধটী পরে দেশে ফিরে এলাম, ভাবলাম অজাতশত্রু রাজাই জাতশত্রু।
ভালো লাগল না, আমাদের লিচ্ছবিবিংশে রাজার সংখ্যা ৭৭০৭।
কেউ একবর্ণ সংস্কৃত জানে না, এইসব অসংস্কৃত রাজা
ভাবলাম কষায় পরব, শরণ নেব সংঘের।
অবাক কাণ্ড, আশি বছরের বুদ্ধ আমাকে দিল উপসম্পদা;
আমি তার শেষ শ্রাবক।
তারপর সুগত গেল, ভাবলাম ভালোই হলো।
ভালো লাগল না অভিধর্ম নিয়ে আনন্দ আর উপালির বিতণ্ডা।

এবার আমার ধর্ম আমার কাছে।
ভেবে ফিরে গেলাম বৈশালীতে।
ভেবেছিলাম প্রৌঢ় বিট হয়ে কাটিয়ে দেব দিনগুলো।
কে বলেছে, বেশ করে তাই ওরা বেশ্যা।
রূপবান এক অনতিতরুণকে বারবার উলঙ্গ করেও ওদের ক্ষান্তি নেই।

ভাবছি তাহলে নগ্ন আজীবিকদের মধ্যে শান্তি আছে।
চাইলে ভিড়ে যাওয়া চলে দিগম্বর জৈনদের দলে।
হয়তো এতদিন মস্করী গোশাল বিগত, তার বন্ধু নাকি শত্রু মহাবীরও নেই

কিছুতে কিছু আসে যায় না, যাওয়া যায় গুরু সঞ্জয় বেলথিপুত্রের কাছে।
পকুধ কাত্যায়নকে গুরু করে তার ককুদ নিয়ে খেলা করলে হয়।

কিংবা ফেরা যায় লিচ্ছবিদের মধ্যে;
অঙ্গে তোলা যায় বর্ম কবচ, মগধ রাজের বিরোধিতার অঙ্গীকার।
জিতে এসে বিছানায় ডাকা যায় সন্তানের মাকে;
হেরে এসে সটান শুয়ে পড়া যায় শ্মশানে।
ভ্রূণ হয়ে ফেরা যায় জঠরে।
ভালো লাগে না, ব্রাহ্মণদের জন্মান্তরের ধারণায় আমার আস্থা নেই।"[৩৪]
('নির্গ্রন্থ', 'প্রদোষের নীল ছায়া')

এখানে নেতি নেতি করে শ্মশানের দিকে চলে গেছে মানুষ, কোনো ধর্মকে সঙ্গে না নিয়ে। নেয়নি বিশেষ কোনো বিশ্বাস। জীবনযাপনটাই কবির কাছে বড় কথা। এবং এ বিশ্বাস এসেছে লোকসমাজ থেকে। কেননা কোনো 'বাদ' কিম্বা 'ধর্ম' গ্রামীণ অক্ষরহীন নিম্নবর্গীয় মানুষগুলোকে অত্যাচার থেকে নিস্কৃতি দেয়নি। পীড়ন থেকে বাঁচায়নি। তাই তাদের মত লোকায়তিক আর কে আছে ? কবি সেই লোকায়ত ধর্ম এবং বিশ্বাসের কাছে নতজানু হয়েছেন।

তথ্যসূত্র

১। রামায়ণের আদিকাণ্ডের পঞ্চম সর্গে কোশল নামক দেশে সর্ব্বলোক বিখ্যাতা অযোধ্যানাম্নী নগরী আছে। যে নগরীকে মানবেন্দ্র মনু স্বয়ং নির্মাণ করেছিলেন। যে মহাপুরী সুবিভক্ত, মহাপথে সুশোভিতা। ....। রাজা দশরথ সেই নগরীর অনেক বসতি বৃদ্ধি করেন। তাতে সর্ব্বশল্য-বিশারদ ব্যক্তি এবং অনেক সূত ও মাগধ বাস করত :

"সূতমাগধসম্বাধাং শ্রীমতী মতুল প্রভাম্।
উচ্চাটাল ধ্বজবতীং শতঘ্নীশত সঙ্কুলাম্"।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রী পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদিত), 'রামায়ণম', বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী, কলকাতা ১৪০৭, পৃ. ১৩-১৪।

২। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 'লোকায়ত দর্শন'-১ম খণ্ড, নিউএজ, ২য় সংস্করণ - ১ম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ১।

৩। তদেব, পৃ. ৩।

৪। "লোকায়ত জীবনের সামগ্রিক কৃতি যা মৌখিক ধারায় বিবর্তিত সাহিত্য, অনুকরণের মাধ্যমে প্রচলিত চারুকলা ও কারুকলার যাবতীয় সম্পদ ঐতিহ্যানুসারী বিশ্বাস-আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব-পার্বণ-ঔষধ-পথ্য- ক্রীড়া-নৃত্য-অভিনয়-খাদ্য-যানবাহন ইত্যাদিতে বিস্তৃত।"

ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়, 'লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান', এ মুখার্জী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, জুলাই ১৯৮৫, পৃ. ৫০।

৫। তদেব, পৃ. ৫০।

৬। বীতশোক ভট্টাচার্য : 'কবিতার অ, আ, ক, খ', বিতর্ক, কলকাতা, ১৪০৪, পৃ. ৩১-৪০।

৭। "বেসরকারি একটা ভাষায় লেখা বলে সচেতনভাবে আর প্রবণতাবশে বাংলা কবিতা লোককাব্য হয়ে উঠেছিল। এর চরিত্র অনান্দনিক, এর স্বভাব গ্রাম্য, নিরক্ষর সাহিত্যরুচিহীন এইসব রচনা থেকে কোনো শীলিত প্রসাদ কখনো পাওয়া যাবে না – এই অজুহাতে লোককবিতাকে অনেকটাই আমরা বর্জন এবং উপেক্ষা করে এসেছি। তবু লোক কবিতার ঐতিহ্য যে বাংলায় সক্রিয়, একথা বলা বেশি হবে।"

বীতশোক ভট্টাচার্য , 'হাজার বছরের বাংলা কবিতা', বাণীশিল্প, কলকাতা, ১৩৮৮, পৃ. ২৪।

৮। কবির 'অন্তর্জলি' কবিতাটি 'অগ্রন্থিত কবিতা'র অন্তর্ভূক্ত। এখানের বেশকিছু সংখ্যক কবিতা ১৯৭০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে 'অন্তর্জলি' কবিতাটি স্থান পায় 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য়।

বীতশোক ভট্টাচার্য , 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১২৮।

৯। 'যাই' কবিতাটিও 'অগ্রন্থিত কবিতা'র অন্তর্ভূক্ত। কিছু কবিতা ১৯৭০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত। পরে 'যাই' কবিতাটি 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় স্থান পায়।

বীতশোক ভট্টাচার্য , 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', বাণীশিল্প, কলকাতা, পৃ. ১৩১।

১০। বীতশোক ভট্টাচার্য , 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০৪। পৃ. ভূমিকা অংশ।

১১। 'শম' কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'প্রদোষের নীল ছায়া' গ্রন্থে ২০০১ সালে। পরে কবিতাটি স্থান পায় 'কবিতা সংগ্রহ'এ।

বীতশোক ভট্টাচার্য , 'কবিতা সংগ্রহ', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২৪৩।

১২। সূক্তে আছে :

"ঊষা যেমন রাত্রির অন্ধকার দূর করে সেরূপ আবরক ক্ষেত্রিয় ব্যাধি দূর হোক। ক্ষেত্রিয় ব্যাধির বিনাশকারী বীরুৎ এই রোগ দূর করুক। কপিলবর্ণ অর্জুন বৃক্ষের খণ্ড, যবের তুষ ও তিল মঞ্জরীর তৈরি মণি তোমার রোগ দূর করুক। হে রুগ্ন তোমার রোগ উপশমের জন্য বৃষভযুক্ত লাঙ্গলের উদ্দেশে নমস্কার, হলের ঈষা ও যুগের উদ্দেশে নমস্কার, শূণ্যগৃহের উদ্দেশে নমস্কার ইত্যাদি।"

'অথর্ববেদ', দ্বিতীয় খণ্ড/ ১ম অনুবাক, ত্রিশ সূক্ত, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা। পৃ. ৩০২/৩

১৩। 'ঋগ্বেদ', চতুর্থ মণ্ডল, ত্রিশ সূক্ত, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৫০৪/৫।

১৪। চারটি বেদের চতুর্থ বেদ অর্থব বেদ। এই বেদ ব্রহ্মার উত্তর মুখ থেকে নিঃসৃত। ভাগবতকার বলেন, অর্থববেদ ব্রহ্মার পূর্ব্বমুখ থেকে বিনিঃসৃত। বিষ্ণুপুরাণে প্রথমে এক বেদ ছিল। পরে ব্রহ্মার আদেশে ব্যাসদেব তা চারভাগে বিভক্ত করে পৈলকে ঋক্‌বেদ,

বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ এবং সুমন্তকে অথর্ববেদ শ্রবণ করতে নিযুক্ত করেন। কারও কারও মতে অথর্ববেদ বেদমধ্যে গণ্য নয়, মহামতি মনু ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদের উল্লেখ করেছেন। অমরকোষেও সেরূপ দেখতে পাওয়া যায়। সামবেদের ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হয়েছে যে অথর্ব চতুর্থ বেদ এবং পুরাণ ও ইতিহাস পঞ্চম বেদ। উইলসন সাহেবের মতে অথর্ব বেদ নয়, বেদের ক্রোড়পত্র মাত্র। অথ শব্দ (মঙ্গল) – ঋ (গমণ করা) + বনিপ্ ক। সং; ক্লী।

শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দত্ত(সম্পাদিত) , 'সরল বাংলা অভিধান', নিউ বেঙ্গল প্রেস, কলিকাতা, ১৩২৩, পৃ. ৩২।

১৫। HEINRICH ZIMMER, 'MYTHS AND SYMBOLS IN INDIA ART AND CIVILIZATION' ,M.L.B.D., DELHI, 1990, P. 16.

১৬। ড. নিতাই জানা (সম্পাদিত), 'কালবেলা', তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর, মহালয়া ২০০০, পৃ. ৩২-৩৩।

১৭। নিরঞ্জন মিশ্র (সম্পাদিত), 'সংকলিতা : সুচেতনা', মহিষাদল, পূর্ব মেদিনীপুর, ৩১ সংখ্যা, ২০১৩, পৃ. ১৬-২০।

১৮। 'বিচার' কবিতাটি কবির 'অগ্রন্থিত কবিতা'র অন্তর্ভূক্ত।

১৯। 'যাত্রা' কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'নতুন কবিতা' গ্রন্থে ১৯৯২ সালে। পরে কবিতাটি স্থান পায় 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য়।

বীতশোক ভট্টাচার্য , 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৬৪।

২০। 'তরুণী' কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'অন্যযুগের সখা' গ্রন্থে, ১৯৯১ সালে। পরে কবিতাটি স্থান পায় 'কবিতা সংগ্রহ'-এ।

বীতশোক ভট্টাচার্য , 'কবিতা সংগ্রহ', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২৮।

২১। 'বিধান' কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'এসেছি জলের কাছে' গ্রন্থে ১৩৯৩ সালে। পরে কবিতাটি স্থান পায় 'কবিতা সংগ্রহ'-এ।

বীতশোক ভট্টাচার্য , 'কবিতা সংগ্রহ', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৯৩।

২২। 'বাংলা সাহিত্য পণ্ডিতদের ঘরে জন্মায় নি, জন্মেছে লোকগুরুদের হাতে লোকজীবনের বুকে।'

গোপাল হালদার , 'বাঙলা সাহিত্যের রূপ ও রেখা - ১ম খণ্ড', এ. মুখার্জী, কলকাতা, ১৩৮০। পৃ. ৭৪

২৩। ঢেন্ঢণ পা'র কবিতা :

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।

হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।।

বেগ সংসার বড়হিল জাঅ।

দুহিল দুধু কি বেন্টে ষামায়।।

বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে।

পিটা দুহি এ এতিনা সাঁঝ্যে।

সুকুমার সেন, 'চর্যাগীতি পদাবলী',' আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৩৩।

২৪। 'মন্দির' কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'এসেছি জলের কাছে' গ্রন্থে ১৩৯৩ সালে। পরে কবিতাটি স্থান পায় 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য়।

বীতশোক ভট্টাচার্য , 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৪৬।

২৫। 'ছৌ' কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'এসেছি জলের কাছে' গ্রন্থে ১৩৯৩ সালে। পরে কবিতাটি স্থান পায় 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য়।

বীতশোক ভট্টাচার্য , 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৪২।

২৬। মালদহ জেলার কালিয়াচকে 'গম্ভীরা' শিবকেন্দ্রিক একটি জনপ্রিয় লোকায়ত সংস্কৃতিবাহী অনুষ্ঠান। শিব মাহাত্ম্য জ্ঞাপক এই অনুষ্ঠানে শিব সেজে নিম্নবর্ণের মানুষেরা এই সময় বিশেষভাবে নাচ গান অভিনয় করে।

ড. অমলকান্তি পাণ্ডে , 'বর্ষশেষের গাজন - চড়ক - গম্ভীরা', সব্যসাচী পত্রিকা, ২৪৬ সংখ্যা, ২৮তম বর্ষ, প: মেদিনীপুর, ১২ এপ্রিল, ২০১৬, পৃ. ৮।

২৭। 'সে-দিন' কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'জলের তিলক' গ্রন্থে ২০০৩ সালে।

বীতশোক ভট্টাচার্য , 'জলের তিলক', আনন্দ, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২১।

২৮। 'যাত্রা' কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'দ্বিরাগমন' গ্রন্থে ১৯৯৭ সালে। পরে কবিতাটি স্থান পায়

‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’য়।

বীতশোক ভট্টাচার্য , ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’, বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৪৭।

২৯। বীতশোক ভট্টাচার্য, ‘কবিতার অ আ ক খ’, বিতর্ক, কলকাতা, ১৪০৪, পৃ. ৩২।

৩০। ‘মেলা’ কবিতাটি প্রকাশিত হয় ‘দ্বিরাগমন’ গ্রন্থে ১৯৯৭ সালে। পরে কবিতাটি স্থান পায় ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’য়।

বীতশোক ভট্টাচার্য , ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’, বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৪৯।

৩১। ‘মন্দির’ (দেবী) কবিতাটি প্রকাশিত হয় ‘জলের তিলক’ গ্রন্থে ২০০৩ সালে।

বীতশোক ভট্টাচার্য , ‘জলের তিলক’, আনন্দ, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১০।

৩২। অমিতাভ গুপ্ত, ‘মাতা ও মৃত্তিকা’, ‘অন্যধারা’ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৩৭।

৩৩। ‘রামধনু’ কবিতাটি প্রকাশিত হয় ‘আরেকভুবন’ গ্রন্থে। পরে কবিতাটি স্থান পায় ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’য়।

নির্মল হালদার , ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’, দে’জ, কলকাতা, ২০০০ জানুয়ারি, পৃ. ৮৮।

পরে এই কবিতাটি ‘কবিতা সংগ্রহ’-এ স্থান পায়।

নির্মল হালদার , ‘কবিতা সংগ্রহ’, ‘ছোঁয়া’, ২০১৩, পৃ. ১৮৬।

৩৪। ‘নির্গ্রন্থ’ কবিতাটি প্রকাশিত হয় ‘প্রদোষের নীল ছায়া’ গ্রন্থে ২০০১ সালে। পরে কবিতাটি স্থান পায় ‘কবিতা সংগ্রহ’-এ।

বীতশোক ভট্টাচার্য , ‘কবিতা সংগ্রহ’, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২৪১।